লা ল কি ল্লা র কা হি নি

মোগল শাহজাদিদের কান্না

খাজা হাসান নিজামী

অনুবাদ

আনোয়ার হোসেইন মঞ্জু

ঐতিহ্য

ভূমিকা

১৮৫৭ সালে সিপাহি বিদ্রোহের পর ভারতবর্ষে মোগল শাসনের শেষ নিশানাটুকুও বিলীন হয়ে যায়। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি দিল্লির ওপর তাদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে এবং লালকিল্লায় শেষ মোগল সম্রাট বাহাদুর শাহ জাফরের বিরুদ্ধে সাজানো মামলায় সিপাহি বিদ্রোহের কারণে অভিযুক্ত করে বিচারের নামে একটি 'ঐতিহাসিক অবিচার' সম্পন্ন করে ১৮৫৮ সালে তাঁকে বার্মার (মিয়ানমার) রেঙ্গুনে (ইয়াঙ্গুন) নির্বাসনে পাঠিয়ে দেয়। কয়েক বছর পর ১৮৬২ সালে তিনি সেখানে ইন্তেকাল করেন।

ব্রিটিশরা সাগর পাড়ি দিয়ে সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে ভারতের দক্ষিণ অংশে পৌঁছায় এবং মোগল সম্রাট ও শাহজাদাদের কাছে ধরনা দেয় বাণিজ্যসুবিধা লাভের আশায়। তারা ছিল লন্ডনকেন্দ্রিক ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্মচারী, যে কোম্পানিকে রানি প্রথম এলিজাবেথ ১৬০০ খ্রিষ্টাব্দের শেষ দিবসে এক সনদ দেন প্রাচ্যে তাদের একচেটিয়া বাণিজ্য করার সুযোগ অনুমোদন করে। তারা নিজেদের আস্তানায় থাকত এবং ভারতবর্ষ যে তাদের স্থায়ী আবাস হবে না এবং শুধু ব্যবসা করে মুনাফা হাসিল করে তাদের ছোট্ট দ্বীপদেশে চলে যাবে, সে কথা তারা প্রকাশ্যে বলত।

মোগল সম্রাটদের শাসনের কেন্দ্র দিল্লিতে তখনো তারা শক্তিশালী। ব্রিটিশরা স্বপ্নেও কখনো ভাবেনি যে তাদের পক্ষে এত বিশাল একটি সাম্রাজ্যের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে। কিন্তু মোগল শাসনের অবক্ষয় সূচিত হলে কেন্দ্রেও তার প্রভাব পড়ে এবং দিকে দিকে মাথাচাড়া দিয়ে ওঠা বিদ্রোহ দমনে শৈথিল্য ও সংহতির অভাব দেখা দেয়। এ পরিস্থিতির সুযোগ পুরোপুরিই গ্রহণ করে ইংরেজরা। বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী, সম্প্রদায় ও রাজন্যদের পরস্পরের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির মাধ্যমে তারা নিজেদের রক্ষা তো করেই, অন্যদিকে একের পর এক সাফল্যে উচ্চাভিলাষী হয়ে উপমহাদেশের সমগ্র ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে নিজেদের প্রতিষ্ঠার পূর্ব পর্যন্ত আর থেমে থাকেনি। যেহেতু তারা এসেছে ব্যবসা করতে এবং ক্ষমতার শীর্ষে বসানোর মতো কোনো রাজা ছিল না, তা ছাড়া সংখ্যাধিক্যের কাছে তারা দুর্বল ছিল, সে জন্য গ্রহণ করেছিল বিভেদ সৃষ্টি করে শাসনের কৌশল। ১৭৫৭ সালে লর্ড ক্লাইভ পলাশীর প্রান্তরে বাংলার স্বাধীন নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে ষড়যন্ত্রমূলক যুদ্ধে পরাজিত করে উপমহাদেশে ব্রিটিশ রাজনৈতিক ক্ষমতার ভিত্তি স্থাপন করে। কিন্তু ১৮৪৯ সালে শিখদের নিয়ন্ত্রণ থেকে পাঞ্জাব দখল করার পূর্ব পর্যন্ত ভারতবর্ষে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বিজয় সম্পন্ন হয়নি।

ভারতবর্ষে বিরাজমান তখনকার নৈরাজ্যময় পরিস্থিতি ইংরেজদের উদ্দেশ্য সাধনের অনুকূলে ছিল। ভারতীয়দের বিরুদ্ধে ভারতীয় সিপাহি নিয়োগে এবং এক

দেশীয় রাজার বিরুদ্ধে লড়তে আরেকজন রাজার সমর্থন লাভের ক্ষেত্রে তাদের কোনো অসুবিধাই ঘটেনি। ব্রিটিশ বেনিয়া শক্তিকে এ দেশ থেকে বিতাড়ন করার সবচেয়ে বড় উদ্যোগ ছিল ১৮৫৭ সালে সংঘটিত সিপাহি বিদ্রোহ। কিন্তু এই মহাবিদ্রোহের আগেই ঘটে গেছে অনেক নাটক।

মোগল সম্রাটদের মধ্যে সর্বপ্রথম যিনি ইংরেজদের হাতের পুতুলে পরিণত হন, তাঁর নাম শাহ আলম (১৭৫৯—১৮০৬)। ১৭০৭ সালে সম্রাট আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর মারাঠা, শিখ ও জাটদের মতো শক্তিশালী অমুসলিম সামরিক গোষ্ঠীগুলো অধিক শক্তিশালী হয়ে ওঠে। বিভিন্ন প্রদেশের সুবেদাররাও মোগলদের নিয়ন্ত্রণমুক্ত স্বাধীন রাজ্য শাসনের স্বপ্ন দেখতে শুরু করে। ১৭২৪ সালে নিজাম-উল-মুলক উজির পদ বর্জন করে দক্ষিণাঞ্চলীয় প্রদেশগুলোর কার্যত স্বাধীন শাসকে পরিণত হন। আলিবর্দি খান নবাব হিসেবে নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করেন বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার।

১৭৩৮ সালে মারাঠারা দিল্লির ওপর হামলা চালায় এবং মোগল সম্রাট মোহাম্মদ শাহকে বাধ্য করে মালওয়া এলাকাকে তাদের হাতে অর্পণ করতে, যার ফলে উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের মধ্যে এক প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়। পরের বছরই পারস্যের নাদির শাহ দিল্লিতে অভিযান চালান, নগরীর দশ হাজারের অধিক অধিবাসীকে হত্যা করেন। তিনি লুণ্ঠন করে নিয়ে যান 'তখত-ই-তাউস' বা ময়ূর সিংহাসন, কোহিনুর হীরাসহ বিপুল পরিমাণ ধনসম্পদ। মোহাম্মদ শাহ মোগল ঐশ্বর্য হারানোর পাশাপাশি সম্পদশূন্য হয়ে পড়েন। মোগল রাজধানী পরিণত হয় ষড়যন্ত্রের লীলাভূমিতে। পরবর্তী মোগল সম্রাট দ্বিতীয় আলমগীর (১৭৫৪—৫৯) তাঁর উচ্চাভিলাষী মন্ত্রী গাজী-উদ-দীনের পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে ছিলেন। এমনকি তাঁর উত্তরসূরি শাহজাদা আলী গরহর পর্যন্ত মন্ত্রীর নজরদারির বাইরে ছিল না। ১৭৫৮ সালে আলী গওহর তাঁর কিছু সমর্থককে নিয়ে তাঁদের ওপর ক্ষমতা বিস্তারকারীদের উৎখাত করেন। সম্রাট তাঁকে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার শাসনকর্তা হিসেবে দায়িত্ব প্রদান করেন সাম্রাজ্যের পূর্বাঞ্চলে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে এবং মোগল বংশের ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনতে। পরবর্তী বছর সম্রাট দ্বিতীয় আলমগীর দিল্লিতে ঘাতকের হাতে নিহত হন। এই দুঃখজনক সংবাদ পাওয়ার পর শাহজাদা আলী গওহর নিজেকে সম্রাট হিসেবে ঘোষণা করে শাহ আলম খেতাব ধারণ করেন (১৭৫৯)। তিনি সুজা-উদ-দৌলাকে নিয়োগ করেন অযোধ্যার নবাব এবং মোগল সাম্রাজ্যের উজিরের পদও দান করেন। কিন্তু তাঁর উদ্যোগ ব্যর্থ হয়, কিছুটা নবাবের অযোগ্যতার কারণে এবং প্রধানত ব্রিটিশ চক্রান্তের কারণে, যারা ক্ষমতার দ্বন্দ্বে শক্তিশালী পক্ষ ছিল। ১৭৬০ সালে শাহ আলমের বাহিনীর পাটনার কাছে ব্রিটিশ ও মীর জাফরের পুত্র মিরনের যৌথ বাহিনীর কাছে পরাজিত হওয়ার ঘটনা মোগল স্থিতির ওপর চরম আঘাত ছিল।

দিল্লির অস্থিতিশীল পরিস্থিতি মারাঠাদের উৎসাহী করে তোলে রাজধানী থেকে সাম্রাজ্য শাসন করতে। কিন্তু ১৭৬১ সালে আফগানিস্তানের আহমদ শাহ আবদালি পানিপথে মারাঠাদের চূড়ান্তভাবে পরাস্ত করে শাহ আলমকেই মোগল সম্রাট হিসেবে স্বীকৃতি জানিয়ে তাঁকে দিল্লি থেকে শাসন পরিচালনায় আমন্ত্রণ জানান। শাহ আলম

বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দিওয়ানি ব্রিটিশদের ওপর ন্যস্ত করে দিল্লি অভিমুখে রওনা হন। কিন্তু এলাহাবাদে পৌঁছার পর নবাব সুজা-উদ-দৌলা তাঁকে সম্মানিত অতিথি হিসেবে মর্যাদা দেওয়ার পরিবর্তে বন্দী হিসেবে আচরণ করেন।

এদিকে বাংলায় মীর কাশিম স্বাধীনভাবে তাঁর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হলে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ তাঁকে হটিয়ে মীর জাফরকেই আবার নবাব পদে আসীন করে। মীর কাশিম অযোধ্যায় পালিয়ে যান। ১৭৬৪ সালে মীর কাশিম, সুজা-উদ-দৌলা ও শাহ আলমের সম্মিলিত বাহিনী বিহারের বক্সারে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হলে বাংলাকে ব্রিটিশের কবলমুক্ত করার সুযোগেরও অবসান ঘটে। মীর কাশিম ও সুজা-উদ-দৌলা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করলেও সম্রাট শাহ আলম ব্রিটিশের নিরাপত্তা কামনা করেন। সেই মুহূর্ত থেকেই অন্যদের ওপর নির্ভরতা মোগল সম্রাটদের বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়।

সম্রাট শাহ আলম দীর্ঘদিন দিল্লিতে আসতে পারেননি। তাঁকে বসবাস করতে হচ্ছিল এলাহাবাদে। মারাঠারা যখন দিল্লি দখল করে, তখন তাঁর দিল্লি ফেরার সুযোগ ঘটে, মারাঠাদের কাছে এলাহাবাদ ও কোরা হস্তান্তরের চুক্তির অংশ হিসেবে ১৭৭১ সালের ডিসেম্বরে তিনি দিল্লিতে পৌঁছাতে সক্ষম হন। সুযোগ্য মন্ত্রী নজফ খানের পরামর্শে শাহ আলম ভালোভাবেই শাসন পরিচালনা করছিলেন। কিন্তু ১৭৮২ সালে নজফ খানের ইন্তেকালে শাহ আলমের পক্ষে দায়িত্ব পালন সম্ভব হচ্ছিল না। মারাঠা প্রধান মাধো রাও সিন্ধিয়া এবং ব্রিটিশরা তার সাহায্যে এগিয়ে আসে। কিন্তু কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার আগে ১৭৮৪ সালের অক্টোবরে সিন্ধিয়া শাহ আলমের রাজ্যের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করে সম্রাটের প্রতিনিধি হিসেবে। সিন্ধিয়া মোগল সেনাবাহিনীর এবং প্রশাসনিক দায়িত্ব গ্রহণ করে।

১৭৮৭ সালে রোহিলা প্রধান গোলাম কাদির মারাঠ নেতা মাধো রাও সিন্ধিয়াকে পরাজিত করে দিল্লির নিয়ন্ত্রণ নেয় এবং সম্রাট ও তাঁর পরিবারের অন্য সদস্যদের বন্দী করে। শাহ আলমকে অন্ধ করে দেয় গোলাম কাদির। ইতিমধ্যে সিন্ধিয়া শক্তি বৃদ্ধি করে মিরাটের কাছে যুদ্ধে গোলাম কাদিরকে বন্দী করে ১৭৮৯ সালে দিল্লিতে পুনঃপ্রবেশ করে আবার শাহ আলমকে সিংহাসনে বসায়। এবার গোলাম কাদিরকে চক্ষু উৎপাটনের শিকার হতে হয়।

শাহ আলমের দুর্দশার সময়ে ব্রিটিশরা কোনো প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেনি। ফরাসি বিপ্লবের পুত্র নেপোলিয়ন ১৭৮৯ সালে মিসর দখলের পর প্রাচ্যের প্রতি তাঁর আগ্রহ এবং ভারতের উদ্দেশে যাত্রার ইচ্ছা ব্যক্ত করায় ব্রিটিশরা আবার শাহ আলমের প্রতি মনোযোগী হয়ে ওঠে। কিন্তু ব্রিটিশের তৎপরতায় শাহ আলমের ক্ষতিই হচ্ছিল। তাঁকে সতর্কভাবে কাজ করতে হচ্ছিল, কারণ, ব্রিটিশ বা ফরাসি, কোনো পক্ষকেই প্রতিরোধ করতে সক্ষম নন। গোপন যোগাযোগে শেষ পর্যন্ত তিনি ব্রিটিশদের আশ্রয়ে থাকার পক্ষেই সিদ্ধান্ত নেন।

১৮০৩ সালের ১১ সেপ্টেম্বর দিল্লির কাছে ফরাসি সেনাপতি পেরনের সহকারী বোর্গিনের নেতৃত্বাধীন মারাঠা বাহিনীর সাথে ব্রিটিশ বাহিনীর যুদ্ধে ব্রিটিশরা জয়লাভ

করে এবং বোর্গিনসহ ছয়জন ফরাসি অফিসারকে বন্দী করা হয়। এ ঘটনার পর শাহ আলম পুরোপুরি ব্রিটিশদের মর্জির শিকারে পরিণত হন। কিন্তু ব্রিটিশ ও মোগলদের মধ্যে সম্পর্কের ক্ষেত্রে আনুষ্ঠানিকতা বা আইনানুগ বিষয়গুলো ১৮৫৭ সালে সিপাহি বিদ্রোহের পূর্ব পর্যন্ত অস্পষ্টই ছিল। কারণ, তখন বাহাদুর শাহ জাফর ও ভারতে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল বিপরীতমুখী ও পরস্পরবিরোধী। বাহাদুর শাহ বিশ্বাস করতেন যে তিনি ভারতের সম্রাট এবং ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি তাঁর দেশে বণিক ভিন্ন আর কিছু নয়। তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ও তাঁকে বন্দী করে তারা বিদ্রোহ করেছে। অন্যদিকে বিজয়ী ব্রিটিশরা বাহাদুর শাহ জাফরকেই বিদ্রোহের কারণে অভিযুক্ত করে বিচার করেছে। কারণ, তারা তাঁকে ভারতে ব্রিটিশ সরকারের প্রজা হিসেবে বিবেচনা করে।

বণিক থেকে ক্রমান্বয়ে ভারতের শাসক হিসেবে তাদের অবস্থানের পরিবর্তন ঘটায় মোগল সম্রাটের প্রতি ব্রিটিশের দৃষ্টিভঙ্গিও পাল্টে গিয়েছিল। লর্ড ওয়েলসলির সময়ে ব্রিটিশ বাহিনী ভারতে সবচেয়ে শক্তিশালী ছিল। কিন্তু তিনিও দেশীয় শাসকদের মধ্যে প্রতিহিংসা ও ঈর্ষা সৃষ্টি ও তাদের অধীনতামূলক মৈত্রীতে আবদ্ধ করে দেশীয় শাসকদের দুর্বল করে দেন। তিনি যে মোগলদের স্থলে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে ভারতের শাসনক্ষমতায় বসাতে চাচ্ছেন, ইংল্যান্ডে কারো মাঝে যাতে সেই সন্দেহের সৃষ্টি না হয়, সেদিকেও তাঁর সতর্ক দৃষ্টি ছিল। কিন্তু তাঁকে ইংল্যান্ডে ফিরিয়ে নেওয়া হয় তাঁর নিয়োগকর্তাদের সন্তুষ্ট করতে না পারায়।

কিন্তু ওয়েলসলির নীতি পরিত্যক্ত হয়নি। গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস এবং লর্ড ডালহৌসি সেই নীতি অনুসরণ করে মোগলদের ওপর চরম আঘাত হানেন। ১৮০৬ সালের ১৯ নভেম্বর সম্রাট শাহ আলম ইন্তেকাল করেন। পরদিন তাঁর পুত্র আকবর শাহ (১৮০৬-৩৭) মোগল সিংহাসনে আরোহণ করেন। আকবর শাহর অভিষেক অনুষ্ঠানের এক সপ্তাহ পূর্ণ হওয়ার আগেই দিল্লিস্থ ব্রিটিশ রেসিডেন্ট সম্রাটের কাছে তাঁর উত্তরাধিকারী মনোনয়নের বিষয় জানতে চাইলে তিনি তাঁর নয় পুত্রের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ আবু জাফরের নাম ঘোষণা করেন। এই মনোনয়ন জানতে চাওয়ার কারণ—ইংরেজরা সম্রাটের পুত্রদের মধ্যে উত্তরাধিকারের প্রতিদ্বন্দ্বিতা সৃষ্টিতে উৎসাহী ছিল।

১৮৩৭ সালে আকবর শাহর মৃত্যুর পর আবু জাফর মোগল সিংহাসনে আরোহণ করেন আবুল মোজাফফর সিরাজ-আল-দীন মোহাম্মদ বাহাদুর শাহ উপাধি ধারণ করে। পরবর্তী বছরের সূচনাতেই তাঁর সাথে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়, যখন গভর্নর জেনারেল দিল্লিতে আগমনের ইচ্ছা প্রকাশ করেন এবং জানান যে তিনি সম্রাটের সমমর্যাদায় অভ্যর্থনা পেতে চান এবং সম্রাটকে কোনো প্রকাশ 'নজর' দেওয়ার ক্ষেত্রে আপত্তি জানান। কিন্তু সম্রাট বাহাদুর শাহ এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন।

বাহাদুর শাহ তাঁর বার্ষিক পেনশনের পরিমাণ বৃদ্ধির জন্য রানি ভিক্টোরিয়াকে লেখেন ১৮৪৩ সালে। চিঠিতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট কিছু অভিযোগও ছিল তাঁর। এ উদ্যোগের ফলে তাঁর পেনশনের পরিমাণ দ্বিগুণ হলেও তাঁকে সার্বভৌমত্ব প্রদানের দাবি বাতিল করা হয়েছিল। কারণ, ইস্ট ইন্ডিয়া

কোম্পানির স্থানীয় প্রতিনিধিরা মোগল বংশের 'সম্রাট' পদ বিলোপের চক্রান্তে লিপ্ত ছিল। ইতিমধ্যে লর্ড ডালহৌসি দুরভিসন্ধিমূলকভাবে ১৮৪৯ সালে তাঁদের পছন্দ অনুসারে ফখরুদ্দিনকে বাহাদুর শাহর উত্তরাধিকারী মনোনয়নের সুপারিশ করেন। কিন্তু সম্রাট এই সুপারিশের বিরোধিতা করেন। কারণ, তিনি তাঁর প্রিয় পত্নী জিনাত মহলের একাদশবর্ষীয় পুত্র জওয়ান বখতকে উত্তরাধিকারী করার পক্ষে ছিলেন। ভারতে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের সম্মতিতে ব্রিটিশ সরকার ফখরুদ্দিনকেই উত্তরাধিকারী হিসেবে স্বীকৃতি দেয়, যিনি বাহাদুর শাহর পর দিল্লির সিংহাসনে আসীন হবেন। তাঁর ওপর শর্ত আরোপ করা হয় যে পিতার মৃত্যুর পর তিনি সম্রাট উপাধি লাভ করলেও তাঁকে লালকিল্লা ও প্রাসাদ ছেড়ে কুতুব মিনারের কাছে বসবাস করতে হবে।

কিন্তু ১৮৫৬ সালের ১০ জুলাই ফখরুদ্দিন হঠাৎ মারা গেলে উত্তরাধিকারের প্রশ্নটি আবার তীব্র হয়ে ওঠে। ইংরেজদের পছন্দ মির্জা খোরাশ, কিন্তু বাহাদুর শাহ জওয়ান বখতকেই উত্তরাধিকারী ঘোষণা করতে পীড়াপীড়ি করেন। ডালহৌসির পর লর্ড ক্যানিং গভর্নর জেনারেল হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করে মির্জা খোরাশের পক্ষেই তাঁর সিদ্ধান্ত বহাল রাখেন এবং শর্ত আরোপ করা হয় যে বাহাদুর শাহর মৃত্যুর পর তাঁর আর কোনো উত্তরাধিকারী 'সম্রাট' বা 'বাদশাহ' হিসেবে পরিচিত হবে না। তারা শুধু 'শাহজাদা' খেতাব ব্যবহার করতে পারবে।

মোগল সার্বভৌমত্বের সকল ঐতিহ্য থেকে ক্রমে ক্রমে বঞ্চিত করার পর 'সম্রাট' হিসেবে নামমাত্র উপাধি উচ্ছেদ করার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত শুধু মোগলদের মধ্যে নয়, বরং সারা ভারতে গভীর ক্ষোভের সৃষ্টি করে। বিশেষ করে মুসলমানদের মধ্যে ক্ষোভ ও হতাশা ছিল ব্যাপক, কারণ, মোগল সম্রাটকে তারা তাদের ঐতিহ্যের প্রতীক এবং খলিফার মতো বিবেচনা করত। ক্রমবর্ধমান ক্ষোভ ১৮৫৭ সালের সিপাহি বিদ্রোহকে আরো। প্রবল করে তুলেছিল।

ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ বিদ্রোহের পর বাহাদুর শাহকে অকৃতজ্ঞ বিদ্রোহী হিসেবে চিহ্নিত করে। কিন্তু বাস্তবে এই বিদ্রোহ ছিল ব্রিটিশের বিরুদ্ধে উপমহাদেশের স্বাধীনতার যুদ্ধ এবং বাহাদুর শাহ ছিলেন জাতীয়তাবাদী চেতনার প্রতীক। ১৮৫৭ সালের ২৪ এপ্রিল দিল্লি থেকে মাত্র চল্লিশ কিলোমিটার দূরবর্তী মিরাট সেনাশিবিরে ৮৫ জন দেশি সিপাহি ইংল্যান্ড থেকে নতুন আনা এনফিল্ড রাইফেলের কার্তুজ ব্যবহারে অস্বীকৃতি জানায় তাতে গরু ও শূকরের চর্বি ব্যবহার করা হয়েছে বলে। তাদের কোর্ট মার্শালে শাস্তি দেওয়ার পর তাদের সহযোগীরা ১০ মে মিরাটে বিদ্রোহ করে। তারা বন্দীদের মুক্ত করে মিরাটে অবস্থানকারী ব্রিটিশ নাগরিকদের যাকে পায়, তাকেই হত্যা করে। পরদিন ১১ মে তারা দিল্লিতে পৌঁছে। দিল্লিতে তাদের বাধা দেওয়ার কেউ ছিল না, ব্রিটিশ বাহিনীর দেশীয় সৈন্যরা বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগ দেয় এবং শহরের ইউরোপীয়, অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানদের হত্যা করে। প্রায় পঞ্চাশজন ইউরোপীয় নারী-পুরুষ ও শিশুকে বন্দী করে লালকিল্লায় আনা হয়। পরে তাদেরও হত্যা করা হয়।

বিদ্রোহীরা বাহাদুর শাহকে মোগল সম্রাট হিসেবে ঘোষণা করে তাঁকে কুর্নিশ করে এবং নজর দেয়। কিন্তু বিদ্রোহীদের মাঝে শৃঙ্খলা আনার মতো নেতৃত্বের ঘাটতি ছিল। বখত খান নামে বেরেলি থেকে গোলন্দাজ সুবেদারের দিল্লি উপস্থিতির পর তাঁর ওপরই ন্যস্ত হয় বিদ্রোহী সৈন্যদের সেনাপতির দায়িত্ব।

ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ নিজেদের সামলে নিয়ে দিল্লি অভিমুখে যাত্রা করে এবং ১৪ সেপ্টেম্বর দিল্লির ওপর ব্রিটিশ হামলা শুরু হয়। ১৯ সেপ্টেম্বরের মধ্যেই স্পষ্ট হয়ে যায় যে লালকিল্লার পতন ঘটবে। বাহাদুর শাহ সেদিনই মোগল বংশের দ্বিতীয় শাসক সম্রাট হুমায়ুনের দুর্গসদৃশ মাজারে আশ্রয় নেন। পরদিন ক্যাপ্টেন হাডসন তাঁর অধীনস্থ অনিয়মিত পাঞ্জাবি সৈন্যদের পঞ্চাশজনকে নিয়ে হুমায়ুনের মাজারে যান বাহাদুর শাহ ও তাঁর পরিবারের অন্য সদস্যদের বন্দী করতে। বাহাদুর শাহ, জিনাত মহল ও পুত্র জওয়ান বখতের জীবন রক্ষার প্রতিশ্রুতি দিয়ে তাঁদের লালকিল্লায় ফিরিয়ে আনা হয়।

এরপর ক্যাপ্টেন হাডসন আরেক দফা হুমায়ুনের মাজারে গিয়ে সেখান থেকে বন্দী করেন মোগল পরিবারের মির্জা মোগল, খিজির সুলতান ও আবু বকরকে। লালকিল্লায় আটক ইউরোপীয়দের হত্যার সাথে জড়িত থাকার অভিযোগে তাদের লালকিল্লায় আনার পথে গুলি করে হত্যা করা হয়। এদের দুজন বাহাদুর শাহর পুত্র এবং একজন তাঁর নাতি। আত্মসমর্পণকারী নিরস্ত্র শাহজাদাদের হত্যা করতে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ বিন্দুমাত্র দ্বিধা করেনি।

এরপর ইংরেজ ও তাদের এদেশীয় সহচররা দিল্লি নগরীতে এবং দিল্লি থেকে পলায়নপর লোকদের ওপর চড়াও হয়ে মোগল রাজপরিবারের প্রত্যক্ষ ও দূরতম সদস্যদের অনুসন্ধান করতে থাকে প্রতিশোধস্পৃহায়। মোগল রাজপরিবারের অনেক সদস্য ইংরেজদের নিগ্রহ এড়াতে পরিচয় লুকিয়ে ভারতের বিভিন্ন জায়গায় পালিয়ে বেড়াচ্ছিলেন সিপাহি বিদ্রোহের পর থেকেই। ইংরেজরা যাদের গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হয়েছিল, তাদের মধ্যে রাজপরিবারের পুরুষ সদস্যদের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই হত্যা করে এবং তাদের সম্পত্তি কেড়ে নেওয়া হয়। অনেককে নামমাত্র ভাতা প্রদান করে। মোগল পরিবারের সাথে সংশ্লিষ্ট মহিলাদের অবস্থা হয়েছিল সবচেয়ে করুণ। সিপাহি বিদ্রোহের কয়েক দশক পর দিল্লিবাসী খাজা হাসান নিজামী তাদের অনেকের সাথে যোগাযোগ করতে সক্ষম হন। সিপাহি বিদ্রোহের সময় এবং পরবর্তী সময়ে তাঁরা যে পরিস্থিতির মোকাবিলা করেছেন, সে সম্পর্কে তিনি জানার চেষ্টা করেন। তাঁর এই শ্রমসাধ্য প্রচেষ্টার ফলেই প্রকাশিত হয়েছিল উর্দু ভাষায় একটি পুস্তিকা, 'বেগমাত কি আঁসু'। মোগল বংশের অধস্তন সদস্য, বিশেষ করে লালকিল্লা থেকে ছিটকে পড়া শাহজাদিদের করুণ কাহিনিই বিধৃত হয়েছে পুস্তিকাটিতে। ভারতের বিভিন্ন ভাষায় পুস্তিকাটির অনুবাদ হয়েছে। উর্দু ভাষায় আমার জ্ঞান সীমিত। উর্দু বুঝতে ও বলতে পারলেও উর্দু পড়তে না পারায় এটি অনুবাদে আমাকে উর্দু ভাষায় অভিজ্ঞ কয়েকজন বন্ধুর সহায়তা নিতে হয়েছে। সে কারণে পুস্তিকাটি ছোট্ট হলেও অনুবাদকর্ম শেষ করতে দীর্ঘদিন লেগেছে। ২০০৩ সালে বইটি 'ঐতিহ্য' প্রকাশ করেছিল। দুই দশকের বেশি সময় পর 'ঐতিহ্য' পুনরায় বইটি প্রকাশ করতে যাচ্ছে। সেজন্য আমি আনন্দিত এবং 'ঐতিহ্য'র কাছে কৃতজ্ঞ।

আনোয়ার হোসেইন মঞ্জু
নিউইয়র্ক

সূচিপত্র

কুলসুম জমানী বেগম ১৫
গুলবানো ২৩
শাহজাদি ২৮
নার্গিস নজর ৩৮
মহ জামাল ৪৭
সকিনা খানম ৫৭
সবুজ-বসনা ৬৫
মির্জা কমর সুলতান ৬৮
মির্জা দিলদার শাহ ৭১
বাহাদুর শাহ জাফর ৭৩
নাসির-উল-মুলক ৭৬

লেখকের কথা

এক অসহায় তাপসীর বিপন্ন অবস্থার সত্য ঘটনা অবলম্বনে লিখিত কাহিনি এটি, যার ওপর দিয়ে বয়ে গিয়েছিল যুগের পরিবর্তনের প্রচণ্ড এক ঝড়। তাঁর নাম কুলসুম জমানী বেগম। দিল্লির শেষ মোগল সম্রাট বাহাদুর শাহ জাফরের আদরের কন্যা।

তিনি ইন্তেকাল করেছেন বেশ কিছু বছর গত হয়েছে। আমার সঙ্গে বেশ কবার শাহজাদির সাক্ষাৎ হয়েছে এবং তিনি স্বয়ং তাঁর ভাগ্যবিড়ম্বনার কথা বলেছেন আমাকে। আমাদের সকলের শ্রদ্ধেয় দরবেশ হজরত খাজা নিজামুদ্দিন আউলিয়ার প্রতি অশেষ ভক্তি ছিল তাঁর। সে জন্য প্রায়ই তিনি সেখানে যেতেন এবং করুণ কাহিনি শোনার সুযোগ পেতাম আমি। এ গ্রন্থে যতগুলো ঘটনা স্থান পেয়েছে, তার অধিকাংশ স্বয়ং শাহজাদি অথবা তাঁর কন্যা জিনাত জমানী বেগম শুনিয়েছেন। এ গ্রন্থ প্রকাশের সময় জিনাত জমানী বেগম জীবিত ছিলেন এবং দিল্লির পণ্ডিতের মহল্লায় থাকতেন। কাহিনিগুলো একে একে পাঠকের খেদমতে পেশ করছি :

খাজা হাসান নিজামী

কুলসুম জমানী বেগম

আমার আব্বা হুজুরের বাদশাহি যখন শেষ হলো এবং সিংহাসন, মুকুট লুণ্ঠিত হওয়ার সময় ঘনিয়ে এল, তখন দিল্লির লালকিল্লায় কান্নাকাটির রোল পড়ে যায়। চারদিকে আহাজারি, আর্তনাদ। শ্বেতপাথরের সাদা ধবধবে অট্টালিকাগুলো যেন শোকে কালো হয়ে গেছে। তিন বেলা কেউ কিছু খায়নি। জিনাত আমার কোলে। দেড় বছরের শিশুকন্যা দুধের জন্য কাঁদছিল। ভাগ্যে কী ঘটতে যাচ্ছে, সেই দুশ্চিন্তায় আমার স্তনের দুধ শুকিয়ে গেছে। দাইয়ের স্তনও শুষ্ক। আমাদের এই শোকাচ্ছন্ন অবস্থায় 'জিল্লে সুবহানি'র (মোগল সম্রাটদের এভাবেই সম্বোধন করা হতো) বিশেষ খোজা আমাদের তলব করতে এল। তখন মধ্যরাত। নিস্তব্ধ পরিবেশ। চারদিকে গোলাগুলির শব্দে আমাদের বুক কেঁপে কেঁপে উঠছিল। কিন্তু সম্রাটের তলব পাওয়ামাত্র আমরা তার খেদমতে হাজির হলাম। সম্রাট তখন জায়নামাজে বসে আছেন। হাতে তসবিহ। আমি তার সামনে উপস্থিত হয়ে মাথা নত করে তিনবার কদমবুসি করলাম। তিনি আমাকে অত্যন্ত আদর করে কাছে ডাকলেন। বললেন, 'কুলসুম, আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের হাতে তোমাকে সঁপে দিচ্ছি। ভাগ্যে থাকলে আবার দেখা হবে। তুমি তোমার স্বামীকে নিয়ে এক্ষুনি বেরিয়ে পড়ো। আমিও যাব। মন তো কিছুতেই চায় না যে, এই শেষ সময়ে তোমাদের চোখের আড়াল করি। কিন্তু সঙ্গে রাখলে তোমার আরো বিপদ হতে পারে। পৃথকভাবে থাকলে মহান আল্লাহ তাআলা হয়তো ভালো কোনো ব্যবস্থা করে দিতে পারেন।'

এ কথা বলার পর সম্রাট তার কম্পিত হস্ত মোবারক ওপরে ওঠান এবং দীর্ঘক্ষণ ধরে উঁচু গলায় আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ করতে থাকেন :

'রাব্বুল আলামিন, এই ইয়াতিম বাচ্চাগুলোকে তোমার হাতে সোপর্দ করছি। যারা বাস করত রাজপ্রাসাদে, আজ তারা জনমনুষ্যবর্জিত জঙ্গলে যাচ্ছে। দুনিয়ায় ওদের সাহায্য করার কেউ নেই। রাহমানুর রাহিম, তুমি তৈমুরের নামের মর্যাদা রক্ষা করো। এই নিরাশ্রয় অসহায় নারীদের ইজ্জত-আবরু রক্ষা করো। পরওয়ারদিগার, শুধু এদের নয়, তামাম হিন্দুস্থানের সকল হিন্দু-মুসলিম আমার সন্তান। তাদের সবাইকে যাবতীয় দুঃখ-কষ্ট ও জুলুম থেকে তুমি রক্ষা করো।'

এরপর আমার মাথায় হাত রাখলেন। জিনাতকে আদর করলেন। আমার স্বামী মির্জা জিয়াউদ্দিনকে কিছু অলংকার দিয়ে নুর মহলকে দিলেন আমাদের সঙ্গিনী হিসেবে। নুর মহল ছিলেন সম্রাটের বিবিদের একজন। শেষ রাতে কিল্লা থেকে বের হলো আমাদের কাফেলা। দুজন পুরুষ এবং তিনজন মহিলা। পুরুষদের একজন আমার স্বামী মির্জা জিয়াউদ্দিন, অন্যজন মোগল বাদশাহর ভগ্নিপতি মির্জা ওমর সুলতান। মহিলাদের মধ্যে আমি, বেগম নুর মহল এবং বাদশাহর বেয়াইন হাফিজা সুলতান। আমরা যখন গরুর গাড়িতে উঠি, তখন রাতের শেষ প্রহর। আকাশের সব তারা হারিয়ে গেছে। শুধু ঝিলমিল করছে শুকতারা। আমাদের সাজানো সংসার এবং প্রাসাদের পানে শেষবার তাকাতে বুকে ব্যথা জাগল। চোখ ফেটে অশ্রুর ধারা বইল। নুর মহলের চোখেও পানি। সে পানিতে যেন ভোরের একমাত্র তারকার প্রতিচ্ছবি ভেসে উঠেছে।

লালকিল্লা থেকে চিরদিনের মতো বিদায় নিয়ে আমরা কোরালি গ্রামে পৌঁছলাম। আমাদের গাড়িচালকের বাড়িতে যাত্রাবিরতি করলাম। খেতে দেওয়া হলো বাজরার রুটি এবং দধি। সবার পেটে রাজ্যের ক্ষুধা। অতএব, মোটা রুটিও আমাদের কাছে শাহি খানার চেয়ে সুস্বাদু মনে হলো। একটা দিন বেশ নির্ঝঞ্ঝাটে কাটল। পরদিন জাট ও গুজ্জার দস্যুরা কোরালি গ্রামে লুটতরাজ করতে হামলা করল। হামলাকারীদের মধ্যে শত শত মহিলাও ছিল। তারা ডাইনিদের মতো আমাদের ঘিরে ফেলে সমস্ত গয়না এবং কাপড়চোপড় খুলে নিল। নোংরা মহিলাগুলোর জামাকাপড় থেকে বোটকা গন্ধ বের হচ্ছিল, যাতে আমাদের দম আটকে যাওয়ার অবস্থা।

এভাবে লুণ্ঠিত হবার পর আমাদের কাছে এমন কিছু অবশিষ্ট ছিল না, যা দিয়ে এক বেলার খাবার জোটানো সম্ভব। আমরা ভীত, শঙ্কিত। প্রতিমুহূর্তে উদ্বেগ, না জানি এখন কী ঘটে! তৃষ্ণায় জিনাত চিৎকার করে কাঁদছিল। সামনে দিয়ে যাচ্ছিল এক চাষি। তাকে হাঁক দিলাম, 'এই শিশুটার জন্য একটু পানি এনে দিন না, ভাই।' চাষি তখনই মাটির পাত্রে পানি এনে দিল। আমাদের দুর্দশার কথা শুনে বলল, 'আজ থেকে তুমি আমার বোন, আর আমি তোমার ভাই।' লোকটি কোরালি গ্রামের সম্পন্ন গৃহস্থ। তার নাম বাস্তি। গরুর গাড়ি সাজিয়ে এনে বলল, 'যেখানে যেতে চাও, সেখানে পৌঁছে দেব তোমাদের।' আমরা তাকে বললাম, 'মিরাটের আজারায় শাহি হাকিম মীর ফয়েজ আলী থাকেন। তার সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক খুব ভালো। তুমি বরং আমাদের সেখানে পৌঁছে দাও।' বাস্তি আমাদের নিয়ে গেল আজারায়। কিন্তু মীর ফয়েজ আলী চরম দুর্ব্যবহার করলেন আমাদের সাথে। তিনি আমাদের কথা শুনতে অস্বীকার করেন কানের ওপর হাত চেপে ধরে। তার বক্তব্য, 'তোমাদের এখানে থাকতে দিয়ে আমি নিজের ওপর বিপদ ডেকে আনতে পারি না। (গ্রন্থটি প্রকাশিত হবার পর মীর ফয়েজ আলীর পুত্র বিবরণীটি পাঠ করে বলেন যে কুলসুম বেগমের বক্তব্য সঠিক নয়। মীর ফয়েজ তাদের সবাইকে নিজের বাড়িতে রেখেছিলেন এবং প্রয়োজনীয় সাহায্যও করেছিলেন।)

গভীর হতাশায় ভরা সময় ছিল তখন। ইংরেজরা আমাদের পাকড়াও করতে পিছু পিছু আসছে কি না, সে ভয় ছাড়াও পরিস্থিতি এত ঘোলাটে ছিল যে আমাদের ওপরও সবাই বিরূপ। যেন আমাদের কারণেই ইংরেজরা এত জুলুম চালাচ্ছে। আমাদের ইশারায় যারা চলত এবং আমাদের হুকুম তামিল করতে সদা প্রস্তুত থাকত—আজ তারাই আমাদের মুখদর্শন করতেও দ্বিধাগ্রস্ত। চাষি বাস্তিকে অশেষ ধন্যবাদ জানাতে হয় যে শেষ পর্যন্ত সে তার ধর্মবোনকে ছেড়ে যায়নি। আজারায় আশ্রয় না পেয়ে আমরা হায়দরাবাদের পথ ধরলাম। মহিলারা গরুর গাড়িতে, পুরুষেরা পায়ে হেঁটে। তৃতীয় দিবসে এক নদীর তীরে পৌঁছলাম, যেখানে কোয়ালের নবাবের সেনাবাহিনী শিবির স্থাপন করে অবস্থান নিয়েছে। তারা যখন জানতে পারল যে আমরা মোগল সম্রাটের বংশধর, তখন আমাদের অত্যন্ত সমাদর করল এবং হাতিতে উঠিয়ে নদী পার করে দিল। নদীর অপর

তীরে পৌঁছার পরই সামনে থেকে একদল সৈন্য এসে পৌঁছাল এবং নবাবের সৈন্যদের সঙ্গে তাদের যুদ্ধ বেধে গেল।

আমার স্বামী ও মির্জা ওমর সুলতান নবাবের সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়ে যুদ্ধে অংশগ্রহণের আগ্রহ ব্যক্ত করলেন। কিন্তু সেনাপতি অসম্মতি জানিয়ে বললেন, 'আপনারা মহিলাদের নিয়ে এখান থেকে চটজলদি কেটে পড়ুন। আমরা যেভাবে পারি হামলাকারীদের মোকাবিলা করব।' সামনে ফসলের খেত এবং ফসল পেকে উঠেছে। আমরা খেতের মাঝে লুকিয়ে পড়লাম। জানি না, দুশমন আমাদের দেখে ফেলেছিল কি না; অথবা একটা গোলা দিগ্‌ভ্রষ্ট হয়ে খেতে পড়েছিল কি না। এর ফলে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে ওঠে ফসলের খেতে। সেখান থেকে পালাতে হয় আমাদের। কিন্তু আমরা তো পালাতেও শিখিনি। ঘাস, জঙ্গলে পা জড়িয়ে যাওয়ায় বারবার আছড়ে পড়তে থাকি মাটিতে। মাথা ঢাকার ওড়নাও পড়ে রইল খেতে। অনাবৃত মাথায় বুদ্ধিসুদ্ধি লোপ পাওয়ার উপক্রম। অনেক কষ্টে খেত থেকে বের হতে সক্ষম হলাম আমরা। আমার ও নুর মহলের পা ক্ষতবিক্ষত, রক্তাক্ত। পিপাসায় জিহ্বা-গলা পর্যন্ত শুকিয়ে কাঠ। জিনাত বারবার জ্ঞান হারিয়ে ফেলছে। পুরুষেরা আমাদের সামলাচ্ছেন। কিন্তু মহিলাদের সামলানো সহজ নয়।

খেত থেকে বের হবার পরই নুর মহল জ্ঞান হারিয়ে পড়ে গেলেন মাটিতে। জিনাতকে বুকে চেপে ধরে আমি স্বামীর মুখের দিকে তাকাচ্ছিলাম। মনে মনে বলছিলাম, হে আল্লাহ, এখন আমরা কোথায় আশ্রয় নেব। কোথাও কোনো ভরসা দেখা যাচ্ছে না। ভাগ্য এমনই বিড়ম্বিত হয়েছে যে বাদশাহি থেকে আমরা ভিক্ষুকের পর্যায়ে উপনীত হয়েছি। কিন্তু ভিক্ষুকেরাও তো শান্তি ও স্বস্তিতে থাকে। আমাদের ভাগ্যে তা-ও লেখা নেই।

সৈন্যরা যুদ্ধ করতে করতে অনেক দূর চলে গিয়েছিল। বাস্তি গিয়ে নদী থেকে পানি আনল। আমরা পানি পান করলাম। বেগম নুর মহলের চোখেমুখে পানির ঝাপটা দেওয়া হলো। জ্ঞান ফিরে এল তার। তিনি কাঁদতে লাগলেন। বললেন, 'এখনি আমি তোমার আব্বা হুজুর জিল্লে সুবহানিকে স্বপ্নে দেখলাম। শৃঙ্খলিত অবস্থায় তিনি দাঁড়িয়ে আছেন এবং বলছেন : "আজ আমাদের মতো দরিদ্রের জন্য কাঁটা বিছানো ধূলির শয্যা মখমলের ফরাশের চেয়ে ভালো। নুর মহল, হতাশ হোয়ো না। বুকে সাহস